গালিনা গানেইজের

ছবিতে ভূগোল



গালিনা গানেইজের

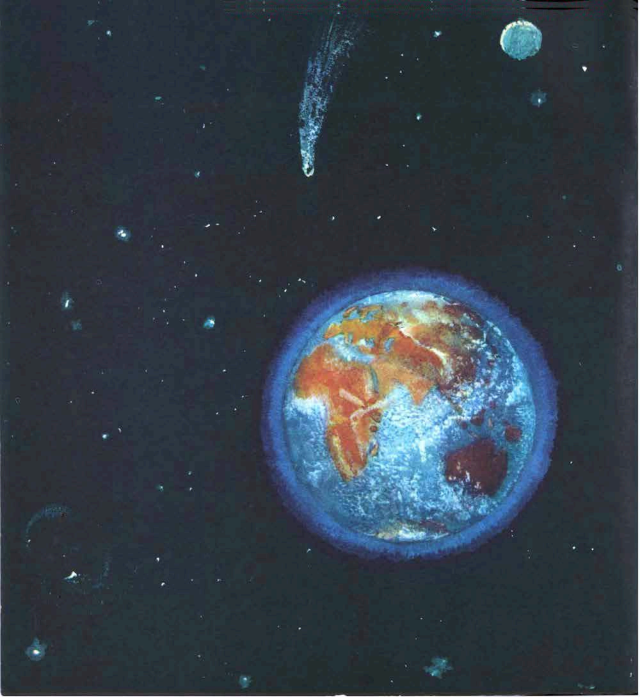
ছবিতে ভূগোল

ছবি এ'কেছেন গ. নিকোলস্কি

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ



প্রগতি প্রকাশন মস্কো





তোমার হাতে সুন্দর একখানি নতুন বই: 'ছবিতে ভূগোল'। ছবি যে কী — সে তো তুমি ভালোই জানো; তবে ভূগোল? ভূগোল হলো সেই বিজ্ঞান যা পাঠ করলে আমরা পৃথিবীর একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাই।

আমাদের এই পৃথিবী — বিশাল এক গোলক। যাঁরা পৃথিবী পরিক্রমণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এ তথ্য বহু পূর্বেই জেনেছে মানুষ। আগে পৃথিবী পরিক্রমণে লাগতো কয়েক বছর। এখন উড়োজাহাজে পৃথিবী ঘুরে আসতে লাগে মাত্র একটি দিন, আর মহাকাশযান হলে — কুল্লে এক ঘণ্টা।

মহাকাশচরেরাই হচ্ছে প্রথম মানুষ যাঁরা স্বচক্ষে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছেন আমাদের এই গোলাকার পৃথিবীর সমগ্র চেহারাটা। তাঁরা দেখেছেন যে পৃথিবীর বেশির ভাগই নীল রঙের। এর কারণ — তার চতুর্দিকেই শুধু জল আর জল।

সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীর স্থলভাগকে কয়েকটি বড়ো বড়ো খণ্ডে করেছে বিভক্ত। এগুলোর নাম **মহাদেশ**। পৃথিবীতে আছে ছ'টি মহাদেশ আর চারটি মহাসাগর। আমাদের মাতৃভূমি — সোভিয়েত ইউনিয়ন — ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশেই প্রসারিত হয়ে আছে।

পৃথিবী সর্বত্রই যে বহুবিচিত্র ও সুন্দর, একথা মানুষ জেনেছে প্রথম পর্যটকদের কাছ থেকেই।

আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে অনেক সমতল প্রান্তর — এগুলোকে বলা হয় সমতলভূমি। সমতলভূমির উপরই গড়ে ওঠে মস্কো, লেনিনগ্রাদ আর খারকভের মতো বড়ো বড়ো শহর। বহু স্থানেই সমতল জমিতে করা হয় চাষবাস। আর প্রান্তর ও বনরাজির ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠে ছোটো-বড়ো নানা গ্রাম। হ্যাঁ, তা বলে ভেবো না — সমভূমি হলেই সেখানে সবসময় লোকজন বাস করে। সমভূমিতে বহু জায়গায় আছে সীমাহীন মরুভূমি, আছে ঘন-নিবিড় বন।

পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বতও অনেক। এমনও উঁচু পর্বত আছে যার উপরে সর্বদা ঠাণ্ডা, এমনকি গ্রীষ্মকালেও সেখানে জমে থাকে বরফ। অনুচ্চ পাহাড়-পর্বতও আছে মেলা। ওগুলো ঘন অরণ্যে ঢাকা। আমাদের দেশে সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলির উচ্চতা সাত কিলোমিটারেরও বেশি। সেগুলো আছে এশিয়া মহাদেশে, পামির মালভূমিতে। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু পর্বত — হিমালয়।

পাহাড়-পর্বত থেকে বেরিয়ে আসে ছোটোখাটো নদী-নালা। ছোটোখাটো নদী-নালা অন্যের সঙ্গে মিলে পরিণত হয় জলভরা বড়ো বড়ো নদীতে। আর নদী গিয়ে পড়ে হয় সাগরে, নয়তো মহাসাগরে। আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ নদীগুলোর অবস্থানও এশিয়াতেই — এগুলো হচ্ছে ওব, ইয়েনিসেই, লেনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-অংশ ইউরোপে পড়েছে সেখানে সবচেয়ে বড়ো নদীর নাম — ভোল্‌গা। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ বৈকাল; তাও আমাদের দেশে অবস্থিত, সাইবেরিয়া অঞ্চলে।

নানান ধরনের দেশ আছে পৃথিবীতে। কোনোটা শীতপ্রধান, কোথাও বা গরম বেশি। নানান জাতের লোক বাস করে সেখানে। নদী ও পাহাড়-পর্বত, অরণ্য ও মরুভূমি, লোকজনের জীবন ও কর্মপ্রবাহ — এই সবকিছু নিয়ে যে গল্প সে-গল্পই হলো ভূগোল।

কিন্তু একটা মাত্র বইয়ে — তা সে বই যত বড়োই হোক না কেন — সব কাহিনী বলা তো সম্ভব নয়। 'ছবিতে ভূগোল' — এই হোক তোমার প্রথম ভূগোল বই, কেমন?

ভূগোলবিদরা হামেশাই পর্যটক, ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশান্তরে। চলো তবে, আমরাও বেরিয়ে পড়ি পথে, একটা উড়োজাহাজে চড়ে।





কম্পাস আর মানচিত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা যেতে চাই। যেতে চাই সেখানে যেখানে সবসময় শীত, আবার সেখানেও যেখানে সর্বদা গরম আবহাওয়া।

তাই সঙ্গে নানান জিনিসপত্র নিতে হবে আমাদের। তবে সর্বাপেক্ষা জরুরী যে-জিনিস, তা হলো — কম্পাস আর মানচিত্র। এরা সঙ্গে থাকলে কোথাও আমরা পথ হারাবো না — না বনেজঙ্গলে, না মরুভূমিতে।

কম্পাসের কালো কাঁটা সবসময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকে। আর যদি আমরা জানতে পারি কোন্ দিকটা উত্তর, তাহলে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সবই খুঁজে বের করা সহজ হয়ে যায়।

দিনের বেলায় ও রাত্রিকালে, ঝড়-তুফান ও তুষার-পাতের সময় সর্বদাই কম্পাস আমাদের পথ খুঁজে পেতে করে সাহায্য।

কিন্তু মানচিত্র আবার কিসের জন্যে? তাছাড়া এই ভৌগোলিক মানচিত্র জিনিসটাই বা কী? পৃথিবীতে যাকিছু আছে তার সমস্তকিছু মানচিত্রে আঁকা থাকে: নদ-নদী, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, শহর সবই।

তা না হয় হলো, কিন্তু মানচিত্র তো পৃথিবীর মতো বিরাট হতে পারে না। তাহলে? ঠিকই বলেছো। তবে তুমি যখন ঘরবাড়ি, সূর্য, পাহাড় কিংবা উড়োজাহাজ আঁকো, সেসবও তো অনেক ছোটোখাটোই হয়ে থাকে।

কম্পাস আর মানচিত্র কিন্তু সবারই দরকার। যারা পৃথিবী সম্বন্ধে জানতে চায়, কি দেশভ্রমণ করতে চায়, জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিতে কিংবা উড়োজাহাজে করে দেশ-দেশান্তর দেখে বেড়াতে চায়, তাদের তো এ দুটো জিনিস অবশ্যই দরকার।

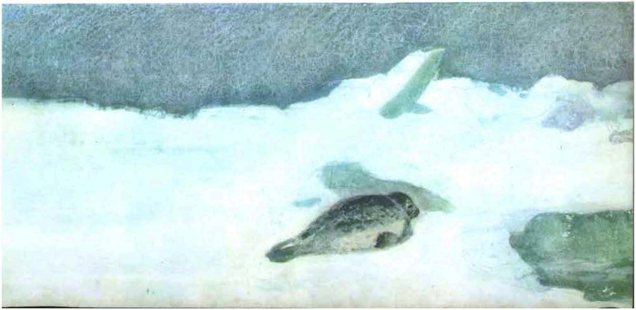


চলো যাই উত্তর মেরু

এখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়। আমাদের দেশের উত্তর দিক থেকেই ভ্রমণ শুরু করবো আমরা, উড়ে যাবো উত্তর মেরুর দিকে। উড়োজাহাজের ডানার নিচে ঝকঝক করছে তুষার আর বরফ; আর বরফের মধ্যিখানে কী দেখছো বলো তো? কালো আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা। এটা হলো আসলে জল। আমরা উত্তর মেরুসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। গ্রীষ্মকালেও এখানে এত ঠাণ্ডা যে বরফ কখনো গলে না। এমনকি মহাশক্তিশালী বরফভাঙা জাহাজও বিশাল পুরু বরফ ভেঙে তার মধ্য দিয়ে রাস্তা করে বড়ো কষ্টে।

আরে দ্যাখো, দ্যাখো, কী কাণ্ড! এ যে দেখছি বরফের ওপর তাঁবু! তার এদিকে-ওদিকে আবার মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই উত্তরে এত দূরে — মানে একেবারে মেরু অঞ্চলে এঁরা আবার কারা, এই চিরন্তন তুষার সাম্রাজ্যের মধ্যিখানে? এঁরা হলেন দুঃসাহসী বিজ্ঞানীর দল। উড়োজাহাজ তাঁদেরকে এই বরফের মধ্যে এনে ফেলেছে। তাঁরা এখানে জল ও বাতাসের তাপমাত্রা মেপে দেখছেন, বাতাসের বেগ ও গতিপথ পরিমাপ করছেন, বরফের গতিবেগের ক্ষিপ্রতা নির্ধারণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। বেতার যন্ত্র মারফত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ দেশের মূল ভূখণ্ডে জানিয়ে দেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে খবরাখবর দিয়ে জাহাজ ও বিমানপোতকে সতর্ক করে দেন।

বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক সময় আবার অপ্রত্যাশিত অতিথিও এসে পড়ে — শ্বেত ভল্লুক। এরা ঠাণ্ডাকে মোটেই ভয় পায় না, বরফজলে সাঁতার কাটতে ভালবাসে। শ্বেত ভল্লুক যখন বরফের উপর শুয়ে থাকে, ওৎ পেতে থাকে সীলমাছ ধরার জন্যে, তখন তাকে প্রায় দেখাই যায় না।





ভাগ্যিস ওরা থাবা দিয়ে নাক ঢাকতে ভুলে যায়। শ্বেত ভাল্লুকের নাকের ডগা কিন্তু কালো।

মেরুবাসীরা কখনো-কখনো ছোটো-ছোটো শ্বেত ভল্লুক পাকড়াও করে। ভাল্লুকছানা খুব তাড়াতাড়ি পোষ মানে, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায় এদের।

আরে, সূর্যিটা কত নিচে চলে এসেছে দ্যাখো! মানে, এখুনি অন্ধকার হয়ে আসবে নাকি? না, না, তা নয়। সূর্যাস্ত দেখতে হলে এখানে কয়েকটা মাস থাকা দরকার! উত্তর মেরুর কাছে বছরের প্রায় ছ' মাসই দিন, আর রাত্তিও ঠিক ঐ পরিমাণই দীর্ঘ হয়। এরকম দীর্ঘ দিন ও রাত্রিকে বলা হয় মেরু দিবস ও মেরু রাত্রি।

আমাদের বিমান নিচে, আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে আরো স্পষ্টভাবে লোকজন দেখতে পাচ্ছি আমরা। তাঁবু থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তাঁরা হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের উড়োজাহাজকে। বরফের উপরে নানান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে — তাও দেখা যাচ্ছে। আর দূরে ঠোকাঠুকি খাওয়া বরফের মধ্যিখানে দেখা যাচ্ছে — উড়োজাহাজ দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে শ্বেত ভল্লুক!

বিমান থেকে মেরুবাসীদের জন্যে চিঠির থলি ফেলে দেয়া হলো, তারপর ফের উঁচুতে উঠতে লাগলাম... বিমানের জানলার কাঁচে তুষারকণা আছড়ে পড়ছে। তাঁবু কিংবা লোকজন কিছুটি আর দেখা যাচ্ছে না। চতুর্দিক একেবারে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। উত্তর মেরুর আবহাওয়া যখন-তখন খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়।

আমাদের সৌভাগ্য যে, উত্তর মেরুর উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে আমরা দেখতে পেয়েছি বরফের রাজ্য আর মেরুসাগর।



হরিণের পিঠে তুন্দ্রাঞ্চল ভ্রমণ

উল্টোপথে উড়ে চললো আমাদের বিমান। এবার আমরা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। মাটিতে অবতরণ করেছি আমরা। চারদিকে, যে-দিকে চোখ যায় শুধু খোলা প্রান্তর। না আছে গাছপালা, না আছে বন। এই হলো তুন্দ্রা।

উত্তর মেরুসাগরের তীর বরাবর ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ তুন্দ্রা অঞ্চল। হরিণের পিঠে চড়ে আমরা তুন্দ্রা ঘুরে বেড়াবো। ছোটো একটা স্লেজগাড়ির সঙ্গে জোতা হয়েছে আঁকাবাঁকা শিঙওয়ালা ছ'টা শক্তিশালী সুন্দর হরিণ।

কয়েকদিন ধরে চলেছি আমরা। চারপাশে শুধু একই দৃশ্য — একই সমতল প্রান্তর, ছোটো ছোটো টিলা সবখানে। টিলাগুলোর মাঝখানের









জায়গা নরম, মাটি স্যাঁতসেঁতে, জলাভূমির মতো, তার উপরে সবুজ ঘন ঘাস। আর ফুল — সে যে কতো, তার ঠিক নেই! হাসিখুশি ঘন নীল ফরগেট-মি-নট, সাদা ফুটফুটে আর্থাঞ্জেলিকা, সোনালী রঙের ঝুমকো ফুল গোল্ড কাপ! টিলাগুলোয় জমে আছে নরম শেওলা, আর তারই মধ্যে ফলছে নানা ফল। ঐ তো দেখা যাচ্ছে হলুদরঙা ক্লাউড্‌বেরী, নীল রঙের গলুবিকা, আর গত বছরের লাল ক্র্যানবেরী। আর ঐ যে — ব্যাঙের ছাতা।

তাজ্জব ব্যাপার! যত রকমের ফল আর ব্যাঙের ছাতায় ভরে আছে, অথচ বনজঙ্গল দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না মানে? নিচের দিকে ভালো মতো ঠাওর করে দ্যাখো, এই যে এখানেই রয়েছে গাছপালা: উইলো আর বার্চ। এই তো, পায়েরই তলায়।

এরা কি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়? মোটেই না। এরা কক্ষনো বাড়ে না। ছোট্টো-ছোট্টো এইসব গাছপালা অনেক পুরনো — অন্তত বিশ-তিরিশ বছরের তো বটেই। তুন্দ্রা অঞ্চলে গরম খুবই কম, যে অল্প সময়টুকু গ্রীষ্ম পড়ে তাও ভয়ানক ঠান্ডা। আর শীতকাল — সে ভয়ানক লম্বা, হিমেল হাওয়া, তুষারঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা লেগে থাকে তখন।

এইসব গাছ যদি একটু মাথা উঁচু করে, অমনি কনকনে ঠান্ডা বাতাস ছুরির মতো তা কেটে ফেলে...

তুন্দ্রা অঞ্চলে আমরা অনেকদিন ধরে চলেছি। অথচ সূর্য এর মধ্যে







একবারও অস্ত গেল না, এলো না রাত্রি। তার মানে — মেরু অঞ্চলের মতো তুন্দ্রাতেও কি তাহলে দিন আর রাত ছ' মাস করে থাকে? না, তা নয়। তুন্দ্রা অঞ্চলেও মেরু দিবস আছে ঠিকই: তুন্দ্রায় গ্রীষ্মকালে দেড় দু' মাস সূর্য অস্ত যায় না, আর শীতকালেও ঐ একই পরিমাণ সময় মেরু রাত্রি চলতে থাকে... কী আর করা! সূর্য থাকে থাকুক না, আমরা আমাদের স্লিপিংব্যাগ পাতবো বার্চ গাছের ওপর, তারপর তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বা চমৎকার একটা ঘুম লাগাবো!

ভালো মতো বিশ্রাম করতে পারলে পথ চলতেও বেশ আনন্দ লাগে, তাই না?

যাই বলো, তুন্দ্রা কিন্তু এক বিস্ময়কর স্থান। ব্যাঙের ছাতা বার্চ গাছের চেয়ে উঁচু, রাত্রেও সূর্য চমকায় মাথার উপরে, ফুল আর ঘাস-পাতা মাড়িয়ে স্লেজে চেপে পথ চলা — সবই বিস্ময়কর। কিন্তু ঘাস-পাতার উপর দিয়ে, তাও আবার স্লেজে চড়ে — কেন? কারণ এ ধরনের উঁচু-নিচু আর জলা জায়গায় অন্য কোনো ধরনের গাড়ি চলে না যে! তুন্দ্রায় যে কোনো রাস্তাঘাট নেই। যেখান দিয়ে ইচ্ছে সেখান দিয়েই যেতে পারো তুমি। লোকজনের বসবাসও কম এখানে: শহর বা জনবসতি বিরল। যেখানে নদী আছে, তার তীরে অবশ্য জেলেরা থাকে, আর তুন্দ্রায় — কি শীতে, কি গ্রীষ্মে — হরিণের পাল নিয়ে যাযাবর জীবন যাপন করে পশুপালকেরা।

গরমের সময় অনেক পাখি উড়ে আসে তুন্দ্রাঞ্চলে। তাদের জন্য আহার আছে এখানে পর্যাপ্ত: ডাঁশ, মশা, বেরি... আর শত্রু বলতে এখানে প্রায় কিছুই নেই। শুধু মাঝে-মাঝে মেরুঅঞ্চলীয় সাদা প্যাঁচা আসে উড়ে বা মেরুশিয়াল গুড়ি মেরে কাছে আসে।

হ্রদে এবং টিলাগুলোয় শেওলার উপরে বাসা তৈরি করে বুনো হাঁস, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, ছানাপোনা বড়ো করে, উড়তে শেখায় তাদের। তারপর যখন উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে শুরু করে, তখন দল বেঁধে তারা উড়ে চলে যায় সুদূর দক্ষিণে।

চলো তবে, আমরাও যাই দক্ষিণে। ফের উড়োজাহাজে করে।



তাইগায়



অরণ্যহীন তুন্দ্রার দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর যেন নিবিড় অরণ্যের পাড় বসানো। এরই নাম 'তাইগা' — দুর্গম অরণ্য, নিষ্ঠুর, বিশাল। এখানে এই গহন বনে বিমান অবতরণের জায়গা মেলা এত সহজ নয়।



আমাদের বিমান উড়ে চলে গেল। চারপাশ শান্ত নিস্তব্ধ। সূর্যস্নাত দিন। মাথার উপরে সাদা মেঘ ছিটোনো স্বচ্ছ সুনীল আকাশ। তাইগাতে সুদীর্ঘ মেরু দিবস বা মেরু রাত্রি কোনোটাই নেই। খুব সকাল-সকাল যদি ঘুম থেকে উঠে পড়ো তো দেখবে কীভাবে সূর্য উঠছে, আর সন্ধ্যেয় তাকে বিদায়ও জানাতে পারবে — তার ঘুমিয়ে পড়ার আগে।

চলো, বনের মধ্যে ঢোকা যাক, কেমন! রাস্তা হারিয়ে ফেলবো না তো? না, না, আমাদের সঙ্গে কম্পাস আর মানচিত্র আছে যে।



ঝকঝকে রোদের দিনেও ফার গাছ ভর্তি বনানী আলো-আঁধারী হয়ে থাকে। নাছোড়বান্দা মশার দল সমানে উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছের ডালপালা জড়াজড়ি করে যেন জাল বুনে রেখেছে, ঝোপঝাড়ের তীক্ষ্ন কাঁটা খাড়া হয়ে আছে দাঁড়িয়ে। কাঁটা ভর্তি জঙ্গল থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই ভালো। উঁহু, সেটি হবার নয়। আমরা যে তাইগার মধ্যে। এখানে তোমার আদরের বার্চ কি হাওয়ায় কাঁপা অ্যাস্পেন কালেভদ্রে চোখে পড়বে।







আরে, ঐ যে একটা ফার — কাঁটা নেই তাতে! পাতাগুলো চ্যাপ্টা, নরম আর সুগন্ধী। এ হলো সিল্‌ভার ফার, সাদামাঠা ফার নয়। পাশেই দ্যাখো — বিশাল এক গাছ। গুঁড়ি কী মোটা, দু-হাতে নাগাল পাবে না, কালচে-লাল বাকল ফাটা-ফাটা। গাছটার ডালপালা দেখতে চাও? তাহলে মাথার টুপিটা হাত দিয়ে চেপে ধরে ঘাড় পিছনে হেলিয়ে মুখ আকাশ পানে তুলে দ্যাখো। এই হলো বিশালদেহী সেডার।

সেডার গাছের সুস্বাদু বাদাম শুধু যে আমরাই — মানুষেরা — পছন্দ করি তা নয়। তার জন্য আসে কাঠবিড়ালী, আসে ডোরাকাটা বুরুন্দুক (এরাও কাঠবিড়ালের মতো দেখতে), আসে সেডার-পাখি। এমনকি তাইগার আসল মালিক ভালুকও পর্যন্ত সেই বাদাম খেতে ছাড়ে না।

আর আছে ঝাউয়ের মতো পাতাওয়ালা গাছ, তবে এর পাতাগুলো হালকা রঙের আর নরম, গজায় এগুলো গুচ্ছাকারে। কিন্তু ঝাউয়ের



মতো এই সূচ সদৃশ পাতার গাছগুলোকে বলা হয় লার্চ গাছ, শীতকালে অন্যান্য সব গাছেরই মতো এই গাছগুলো থেকেও পাতা ঝরে পড়ে।

সাইবেরিয়ার তাইগা হলো বিশেষভাবে নামকরা। সাইবেরীয় তাইগার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সুপ্রশস্ত সব নদী: ওব্, ইয়েনিসেই, লেনা। এই নদীগুলোর তীরে সুবিশাল বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। ব্রাৎস্ক্ এবং ক্রাস্নয়ার্স্ক্ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বৈদ্যুতিক তারে তারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎশক্তি।

তাইগা অঞ্চলে অনেক বড়ো বড়ো শহরও আছে।

তাইগার দক্ষিণে কী ?



তাইগার দক্ষিণেও অরণ্যভূমি। তবে তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ঝাঁকড়া মাথা বার্চ গাছ তাদের শ্বেতকায় দেহ নিয়ে ঝকঝক করছে। গাঁট্টাগোট্টা ওক গাছ তার গ্রন্থিল ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে, তাতে গাঢ় রঙের শক্ত পাতা। আর অ্যাস্পেন গাছ — ঐ তো ওখানেই। দীর্ঘ ডালগুলোর উপরে অ্যাস্পেন পাতা সর্বদাই শিহরিত-মর্মরিত হচ্ছে।

গাছের পাতা কিছুটা হলদে হয়ে গেছে — দেখছো না, এখন যে হেমন্ত এসে গেছে। তবে পাইন আর ফার গাছ কিন্তু পূর্বের মতোই সবুজ। এসব গাছ চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বড়ো এলোমেলোভাবে গজায়।

চলো, আরেকটু ভেতরে যাই — গেলেই দেখতে পাবো অ্যাশ্‌বেরি, বাদাম, আর স্লো-বল গাছ। এই অরণ্যভূমিকে যে 'পাঁচমিশালী বন' বলা হয়, সে অকারণে নয়।

'চিক্‌-চিক্‌-ত্‌র্‌র্‌' — ম্যাগ্‌পাইয়ের (ছাতার জাতীয় পাখি) গুঞ্জন শোনা গেল। ডালে বসে, তেরছা করে ঘাড় বাঁকিয়ে ও আমাদের দেখছে। ভালো মতো খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তারপরেই উড়ে পালালো। ম্যাগ্‌পাইদের কাজ হলো ডাকহরকরার — সারা বনে খবর রটিয়ে দেওয়া: মানুষজন এসে গেছে, বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। না, এখন আর কারো দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না: ঝোপেঝাড়ে খরগোশগুলো চুপটি মেরে বসে আছে, হরিণ-মা বাচ্চাদের







নিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘন জঙ্গলে। একমাত্র গায়ে কাঁটা-পরা সজারুরই কোন পরোয়া নেই: সে চলেছে ধীরেসুস্থে। আর রামবুন্দু গ্রে-হেন পাখি পায়ের মধ্য থেকে ভীষণ শব্দে ডানা ঝাপটিয়ে যাচ্ছে উড়ে।

বনের আরো ভেতরে ঢোকা যাক, চলো। উঁচু-উঁচু হৈমন্তী ঘাস আর বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে, নয়তো পরিত্যক্ত পথের এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয়ই কিছু ব্যাঙের ছাতা আমরা পেয়ে যাবো।



বসন্তে বনের যে কী সুন্দর রূপ! বরফ গলতে না গলতে ফুল ফোটা শুরু হয়ে যায়। ঝরে পড়া ভিজে পাতার নিচে থেকে উঁকি দেয় মজাদার, আঁকাবাঁকা কোঁচকানো ব্যাঙের ছাতা... আর তারপরে আরেকটু গরম পড়লে অমনি পাতা গজাতে শুরু করে বার্চ আর লিণ্ডেন গাছে। ছায়াঘেরা কোণে উঁকি দেয় সুগন্ধী লিলি-অব্-দ্য-ভ্যালী আর রৌদ্রস্নাত মাঠে হেসে ওঠে সোনালী ফুলগুলি...

পাঁচমিশালী বন সব সময়েই বড়ো সোহাগী, তাতে থাকে প্রচুর রোদ। পাঁচমিশালী অরণ্যের চৌহদ্দীতে বাস করে বহু লোকজন। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় এহেন বিশাল বনানীর কোথাও কোথাও আছে ফসলের খেত, গ্রাম আর শহর। এ রকমেরই পাঁচমিশালী অরণ্যরাজির মাঝখানে অবস্থিত আমাদের দেশের রাজধানী — মস্কো নগরী।



স্তেপ

আমাদের ভ্রমণের শেষ নেই।

মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আমাদের উড়োজাহাজ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নদ-নদী, অরণ্যানী, প্রান্তর ও শহর-জনপদ। উপর থেকে পৃথিবীকে একখানা ভৌগোলিক মানচিত্রের মতো দেখাচ্ছে।

আমরা যাচ্ছি এখন দক্ষিণে। বনানী কমে আসছে ধীরে-ধীরে, মাটিকে মনে হচ্ছে রঙীন: ঝিকমিক করে উঠছে কৃষ্ণ ও হরিৎ পৃথিবী, তার মাঠ ও মৃত্তিকা।

মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে আমাদের বিমান। এখন চারপাশে সমতল ভূমি। দৃষ্টি চলে যায় দূরে, বহু দূরে।

মনে আছে তো, আমরা গিয়েছিলাম তুন্দ্রায় — বৃক্ষহীন নিষ্ফলা সমতল ভূমিতে, অরণ্যপ্রাচীর থেকে উত্তরে। আর এখন — সেই ঘনারণ্য থেকে আমরা উড়ে এসেছি দক্ষিণে, ফের দেখতে পাচ্ছি অরণ্যবিহীন রুক্ষ সমতল। কিন্তু তাই বলে তুন্দ্রার মতো মোটেই নয়। কেননা এখানে না পাবে জলাভূমি, না পাবে টিলা।



বিশাল অরণ্যরাজির দক্ষিণে এই যে আদিগন্ত সীমাহীন প্রান্তর এরই নাম স্তেপ। এই স্তেপভূমিতে সূর্যের আলো পাবে তুমি প্রচুর, দিনের পর দিন; তুষারপাত বড়ো কম হয় এখানে, যেটুকু বা হয় বসন্ত সমাগমে সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। আর গ্রীষ্ম এখানে দীর্ঘ এবং উত্তপ্ত। স্তেপের মাটির রঙ





কালো। তাই ওর নামও সেরকম: কৃষ্ণ মৃত্তিকার দেশ। ফসল ফলানোর জন্যে এ মাটি অত্যন্ত উর্বর। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ স্তেপভূমি কর্ষণ করেছে, গম ফলিয়েছে সেখানে, পরে সুগার-বীট, ভুট্টা। উড়োজাহাজ থেকে বহুরঙা চতুষ্কোণ যে খেত দেখেছিলাম তা হলো ফসলের মাঠ। বীজ বপনের পরে কোনোটা শস্যে শ্যামল, আর কোনোটা বা ফসল কাটার পরে শূন্য — নতুন বীজ বপনের জন্যে ফের চষা হচ্ছে...

বসন্ত থেকে হেমন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত ট্র্যাক্টর, কম্বাইন ও অন্যান্য মেশিনপত্র দিয়ে খেতে চাষ, বীজ বপন আর ফসল কাটার কাজ চলতে থাকে।

স্তেপ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বহু যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার আর বড়ো বড়ো শহর।

ঝড়ঝাপটা স্তেপ অঞ্চলে লেগেই আছে। তা থেকে ফসল বাঁচানোর জন্যে লোকে গাছপালা লাগায়। সারি সারি গাছের যে শীর্ণ রেখা আর নানান জাতের ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছ — সবই ক্ষেতের ফসল রক্ষা করে থাকে।



চলো আরো দক্ষিণে





পশ্চিম থেকে পূর্বে সারাটা দেশের উপর দিয়েই স্তেপ তার দেহ ছড়িয়ে আছে শুয়ে। স্তেপের উপর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে পুব দিকে উড়ার পর অবশেষে উরাল পর্বতমালা ছাড়িয়ে এলাম আমরা। তার মানে, আমাদের দেশের যে-অংশ এশিয়া মহাদেশে পড়েছে সেখানে আমরা এসে গেছি। এখানে স্তেপের দক্ষিণে পড়ে আছে মরুভূমি: এদেশের সবচেয়ে বিশাল মরুভূমি — কারাকুম।

ভূমি স্পর্শ করা মাত্রই বিমানের খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো শুষ্ক উত্তপ্ত হাওয়া, যেন কোনো অগ্নিকুণ্ড খুলে দেয়া হয়েছে।



চারপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু কেবল হালকা হলুদ বালি আর বালি। ইশ্, এত বালি কোথাও থাকে! ধুলো-বালি নিয়ে বাচ্চারা খেলতে ভালবাসে — আর এখানে এত বালি যে সারা দুনিয়ার খোকা-খুকুদের তাতে কুলোবে! হ্যাঁ, তবে বালি বড্ডো গরম, এই যা। এত গরম যে খালি পায়ে হাঁটতে পারবে না। মনে হবে, একটু ছায়া পেলে ভালো হতো; কিন্তু ছায়া যে কোথাও নেই। জল পেলে গা-হাত ডুবিয়ে স্নান করা যেতো, কিন্তু হায় — এখানে না আছে কোনো নদী, না কোনো হ্রদ। তেষ্টা মেটাবার জন্যে একটু যে জল পাওয়া যাবে তারও উপায় নেই। কী করা! এসো, জলভরা ফ্লাস্ক তো সকলের কাছেই আছে, তাই খুলে এক ঢোক খেয়ে নিই।

এই বিশাল উত্তপ্ত মরুভূমিতে যেখানে না জন্মায় কোনো গাছপালা, না থাকে কোনো প্রাণী, সেখানে তাহলে এখন আমরা করবো কী?

এসো, সর্বপ্রথম তাঁবুটা অন্তত খাটিয়ে ফেলি। ব্যস্, মাথার উপরে একটু ছায়া তো হলো। জিনিসপত্র যা আছে








তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যাই, প্রাইমাস স্টোভ জ্বালাই, রাতের রান্না চাপিয়ে দিই, চায়ের জলও একটু ফুটিয়ে নেওয়া যাক, কেমন?

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মরুভূমিতে অন্ধকার নামে বড়ো তাড়াতাড়ি। ইশ্, কালো আকাশে কতো তারা ফুটে উঠেছে দেখছো! আর কী নিস্তব্ধতা, কোথাও এতটুকু শব্দ নেই আরে, এ কী — কে যেন কাঁদছে শুনতে পাচ্ছি। মরুভূমিতে বাচ্চা আসবে কোত্থেকে? না, না, শিশু নয়, এ হলো মরু-শৃগাল... এদের কৌতূহল খুব বেশি, কিন্তু ভয়ানক ভীতু। ধরো, আমরা যদি কারো চটি-জোড়া কি ছেঁড়াখোঁড়া ন্যাকড়া তাঁবুর বাইরে রেখে দিই, হতভাগা নির্ঘাৎ এসে চুরি করে নিয়ে পালাবে।

সকাল হয়ে গেছে। আরেকটা নব প্রভাতের মুখ দেখলাম। মরুভূমিতে প্রাতঃকাল এত সুন্দর! সূর্য উঠি-উঠি করছে। এবার তাঁবু থেকে বেরুনো যাক, কি বলো?

রাত্রে অনেক অতিথি এসেছিল দেখতে পাচ্ছি! বালির উপরে হাঁটলে পায়ের দাগ পড়বেই; দেখছো না, সবাই তাদের পদচিহ্ন রেখে গেছে। নানান ধরনের পায়ের ছাপ — কোনোটা বা গর্তের মতো, কোনোটা ফালা-ফালা, কোনো দাগ ঠিক বালির উপর যেন একটা কিছু দিয়ে চিরে দেওয়া। আর এই যে শেয়ালের পায়ের দাগ, থাবা দিয়ে যেন ছাপ মেরে দিয়েছে, দেখতে অবিকল কুকুরের থাবার মতো। মানে কী দাঁড়ালো? অর্থাৎ মরুভূমিতে একেবারেই কেউ থাকে না, এমন তো নয়!

দ্যাখো, দু' সারি ছোটো ছোটো গর্ত কেমন চলে গেছে, ঐ যে উপর পানে যেখানে একটা বালুর টিলা দেখা যাচ্ছে! টিলার উপরে ওঠা কিন্তু সহজ নয়, বালিতে পা গেড়ে যাবে।











যাক্, শেষ পর্যন্ত উঠে গেছি তাহলে। কিন্তু পায়ের ছাপ যে উবে গেছে! যার পায়ের ছাপ সেই প্রাণীটাই বা গেল কোথায়? আরে, মাটির তলে চলে গেল নাকি? হ্যাঁ, প্রায় তাই-ই: ওগুলো টিকটিকির পায়ের ছাপ। কোনোকিছুতে ভয় পেয়ে বেচারা বালির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আবার দ্যাখো, ঐ যে — বালির উপরে আঁকাবাঁকা টান; তার মানে হলো, সাপ গেছে। ওটার দাগও হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। আসলে টিকটিকির পিছু ধাওয়া করে সাপটাও ঢুকে পড়েছে বালির ভেতরে, সেখানেও সে শিকারের পিছন ছাড়ে নি।

আরো পায়ের ছাপ দেখছি যে! এগুলো কাদের? আরে, ঐ যে সামনে, শ্রীমান কচ্ছপ যাচ্ছেন। ঠিক আছে, বেশি দূর যেতে হচ্ছে না বাছাধন, এক্ষুনি গিয়ে ধরছি!

ওটা কী? — ছোট্টো হলদে মতো, চুপটি মেরে পড়ে আছে, পিছনের ঠ্যাং দুটো ওপর পানে তুলে রেখেছে, আর দ্যাখো, দ্যাখো, হঠাৎ শিস্ দিয়ে উঠলো! ওটা — মেঠো কাঠবিড়ালী, গাছে চড়ে না, মাঠে বেড়ায়; এবার ঠিক আমাদের পিছন পিছন আসবে। মাথায় ঝুঁটিওয়ালা একটা পাখি বালির উপরে কেমন দৌড়ে যাচ্ছে, দ্যাখো। ডানা দুটো ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে, বাস্, পাখা মেলে উড়াল দিলো।

মরুভূমিতে আরো বেশি দিন থাকলে আরো অনেককিছুই দেখা যাবে: ভারি মজাদার জের্বোয়া, ছোটোখাটো



'কর্সাক' খ্যাঁকশিয়াল আর সুন্দর কৃষ্ণসার মৃগ 'জেইরান'।

মরুভূমিতে গৃহপালিত জন্তুও আছে, যেমন উট আর ভেড়া। সারা বৎসর ধরে রাখালেরা মরুভূমিতে ওদের চরিয়ে বেড়ায়, এক জলকূপ থেকে আরেকটায় যায়। পাতকুয়ো মরুভূমিতে বিরল ও অত্যন্ত গভীর।

পাতকুয়োগুলো থেকে জল তুলে আনা বেশ কঠিন। স্বভাবতই এ ব্যাপারে উট খুব সাহায্য করে থাকে।

উট, ভেড়া বা কৃষ্ণসার মৃগ — এরা মরুভূমিতে কী খেয়ে বেঁচে থাকে? এরা সবাই যা খেতে পছন্দ করে তা হলো সরু পাতার একরকম অনুচ্চ ঘাস। উট বিশেষভাবে পছন্দ করে কাঁটা-গাছ — ছোটো ছোটো কাঁটাঝোপ, এগুলোকে বলাই হয় উটের কাঁটা।

এপ্রিল মাসে, বসন্তের শুরুতে মরুভূমি একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়।

তখন কতরকম সবুজ ঘাস, কতরকম ফুল! পপি, টিউলিপ, আইরিস। ছোটোখাটো ঝোপ সব ছেয়ে যায় সবুজে, দেখা যায় মরুভূমির একমাত্র গাছ —সাক্‌সাউল্‌। এটা যে মরুভূমি তখন তা মনেই হবে না।

হ্যাঁ, মরুভূমির বসন্ত চমৎকার তো বটেই। কিন্তু নির্দয় সূর্য সমস্ত আর্দ্রতা কেড়ে নিতে চায় বালুরাশির বুক থেকে, তাছাড়া বৃষ্টিপাত নেই — ফলে সমস্ত হরিৎ শোভা দ্রুত শুকিয়ে মরে যায়।

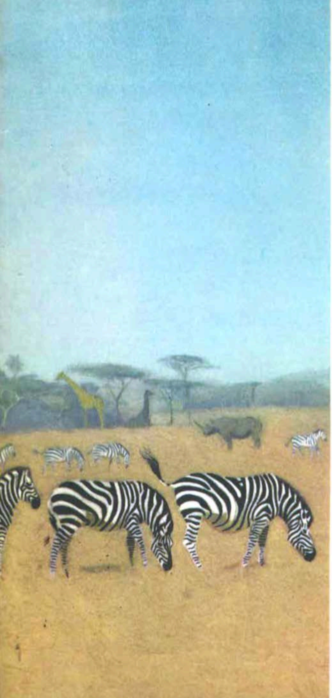












উড়ে চলি

কারাকুম মরুভূমি পড়ে রইলো পিছনে। ভীষণ উঁচু পর্বতগুলি পার হলো আমাদের উড়োজাহাজ। এখন নিচে দেখা যাচ্ছে অতি প্রশস্ত একটি নদীর উপত্যকা। দুর্ভেদ্য অগম্য বাঁশবনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে বাঘ।



আরো দক্ষিণে উড়ে চলেছি আমরা। আফ্রিকা মহাদেশের উপরে এখন এসে গেছে আমাদের উড়োজাহাজ।

আর আমাদের নিচে এখন পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি — সাহারা। অবশ্য আমরা তো ইতিমধ্যেই মরুভূমি দেখে এসেছি। আরো সামনে যাওয়া যাক তাহলে, দেখা যাক আরো দক্ষিণে কী আছে।

এই তো বিস্তীর্ণ সমভূমি, লম্বা ঘাসে ভরা। এখানে-ওখানে বিশাল বিশাল গাছের মাথা ঠিক যেন খোলা ছাতা। ক্ষিপ্র পায়ে কৃষ্ণসার মৃগের পাল দৌড়ে ছুটে গেল। এক গাছ থেকে আরেক গাছে ঢিমে তালে চলাফেরা করছে জিরাফ, খাচ্ছে পাতা। ওখানেই চরে বেড়াচ্ছে ডোরাকাটা জেব্রা আর লম্বা পা-ওয়ালা উটপাখি। জন্তুগুলো প্রায়ই মাথা উঁচু করছে। আসলে ওরা কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করছে — কোথাও কোনো হিংস্র শিকারী জন্তু, সিংহ কি চিতাবাঘ লুকিয়ে নেই তো!



দল বেঁধে হাতিরা যাচ্ছে জল খেতে। দীর্ঘ ঘন ঘাসে ঘেরা হ্রদের কাছে এসে পড়েছে ওরা। জলের মধ্যে থেকে গাছের গুঁড়ির মতো কালো কালো কী

আফ্রিকায়

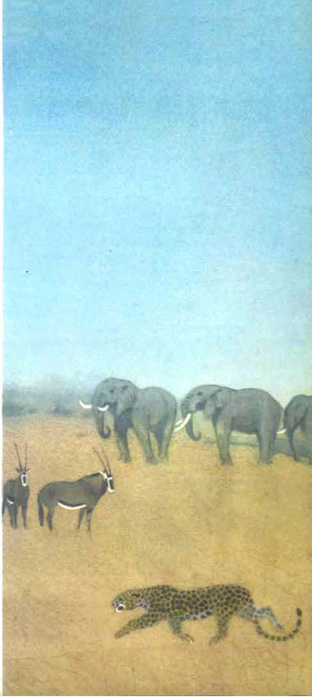
সব মাথা বের করছে। তারা নড়ছে··· সর্বনাশ, কী বিশাল মুখ হাঁ করে উঠলো: জলহস্তী হাই তুলছে। সারাটা দিন জলহস্তীরা জলে পড়ে থাকে, শুধু কেবল সন্ধ্যে হলে ডাঙ্গায় উঠে আহারের সন্ধানে যায়। এখানে হ্রদের বুকে সাঁতার কেটে বেড়ায় হিংস্র কুমির। বিশালদেহী মোটা চামড়ার জলহস্তীদের অবশ্য কুমির দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। আর দাঁতাল কুমিরের শত্রু শুধু একটাই, সে হলো— মানুষ।



যে সমতলভূমির উপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি তা হলো আফ্রিকার স্তেপ — সাভান্না। দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের উত্তরের স্তেপের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। সাভান্না এলাকায় শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত বলে কোনো ঋতু নেই। সেখানে সবসময় অত্যন্ত গরম। অবশ্য বছরের অর্ধেক সময় সেখানে বৃষ্টিপাত হয়, বাকি অর্ধেক একেবারে শুখা মরশুম। খরার সময়ে গাছপালা থেকে পাতা ঝরে পড়ে, ঘাস মরে যায়, পশু-পাখি জীবজন্তু চলে যায় অন্য জায়গায় — যেখানে তাদের খাবার মিলবে তেমন এলাকায়।



সাভান্নাতে হিংস্র শিকারী জীবজন্তু অনেক। বড়ো বড়ো ঘাসের মধ্যে তারা ওৎ পেতে বসে থাকে। আমরা মাটির দিকে এখন আর নামছি না, বরং আরো দক্ষিণের দিকে চলি।



গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য



সাভান্নার দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘন অরণ্য। সাভান্না এলাকার মতো এখানেও সবসময় খুব গরম পড়ে। তবে বৃষ্টিপাত অবশ্য সারা বছর ধরেই হয় এখানে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। বহু গাছই অত্যন্ত উঁচু হয় — ৫০-৬০ মিটার পর্যন্ত। তার মানে এইসব গাছ ১৫-২০ তলা বাড়ির সমান উঁচু। এইসব বিশালাকার মহীরুহের নিচে আবার অপেক্ষাকৃত ছোটো গাছ জন্মায় আর তাদের নিচে জন্মায় আরো ছোটো-ছোটো গাছ। মাটির উপরে আছে ঝোপঝাড়, ফার্ন, ঘাস... সুকঠিন লিয়ানা লতা গাছের মহাকায় গুঁড়ি সাপের মতো পেঁচিয়ে জড়িয়ে রেখেছে, এক গাছ থেকে লাফিয়ে চলে গেছে আরেক গাছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য সবসময়ই আঁধার হয়ে থাকে। নিচে, মাটির কাছে জায়গার অভাবের জন্যে ঘেঁষাঘেঁষি অন্ধকার বনের সমস্ত গাছ-লতাপাতা আলো ও সূর্যের পিপাসায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উপর পানে বেড়ে ওঠে। দু'পাশের গাছপালা না কেটে এই জঙ্গলের মধ্যে পথচলা অসম্ভব। তবে হাতিদের যাওয়া-আসার রাস্তা যদি চোখে পড়ে তাহলে অবশ্য অন্য কথা...

আরে, ঐ গাছটার পাতা কিরকম চেনা মনে হচ্ছে — ঠিক যেন টবে গজানো ফিকুস গাছের পাতার মতো। হ্যাঁ, ঠিক ফিকুস গাছই তো। আফ্রিকাতে ওরা দেখতে এরকমই হয়!









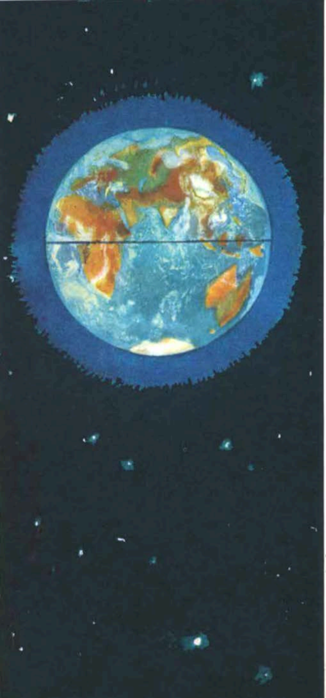
ঐ দ্যাখো, কী উঁচু পাম্ গাছ — মাথার উপরে পুরু মোটাসোটা পাতা ছড়ানো। আরেকটু এগিয়ে গেলেই — কলা গাছ। কলা পাতা — চওড়া, লম্বা, ঠিক যেন তোয়ালে — একেবারে মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে, আর সেই সঙ্গে আছে রাশি রাশি পাকা কলার কাঁদি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে একই গাছে একসঙ্গে ফুল ও ফল চোখে পড়ে।

ঘন অরণ্যে কত বিভিন্ন রকমের পশু ও পাখি যে ছুটোছুটি করছে, উড়ে বেড়াচ্ছে, গাছ বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। তীক্ষ্ণ কর্কশ চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছ না? বাঁদরেরা 'কথা বলছে'। গাছের ডাল ধরে সমানে ঝোলাঝুলি করছে ছটফটে ছোটোখাটো মার্মোসেট বাঁদরেরা। সবচেয়ে বড়ো জাতের বাঁদর — গরিলারাও থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে।

সবুজ গাছপালার ফাঁকে হঠাৎ জলের রেখা চিকচিক করে উঠলো যে... না, আমরা অবশ্য এখন নদীর ধারে যাবো না।

নদী তীরের ঝোপঝাড়ে বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকে, আবার ওদিকে নদীর জলে আছে হিংস্র কুমির।





নিরক্ষরেখা

আমাদের গোলাকার পৃথিবীটাকে যদি সমান দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমনটা ছবিতে দেখছো, তাহলে অর্ধেক-অর্ধেক করে দুটো পৃথিবী আমরা পাবো — এদের প্রতিটিকে বলা হয় গোলার্ধ।

এই দুই গোলার্ধের একটির মধ্যে অবস্থিত উত্তর মেরু। সেজন্যে এটিকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধ। আর যে-গোলার্ধে আছে দক্ষিণ মেরু তার নাম দেয়া হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধ।

যে কাল্পনিক রেখা টেনে গোলাকার পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে, সেই রেখাটির নাম নিরক্ষরেখা।

বুঝতেই পারছো, পৃথিবীর উপরে সত্যি সত্যি এরকম কোনো রেখা নেই।

এই রেখাটি আছে শুধু মানচিত্রে।

উত্তর গোলার্ধে সমগ্র ইউরোপ এবং কিছু দ্বীপ ছাড়া এশিয়া মহাদেশেরও প্রায় সমস্তটা অবস্থিত।

অন্য দিকে দক্ষিণ গোলার্ধের বেশির ভাগই হলো সমুদ্র।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং অ্যান্টার্কটিকা (কুমেরু) দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে পড়েছে।

আমেরিকা ও আফ্রিকা উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধেই প্রসারিত।

দক্ষিণ গোলার্ধে

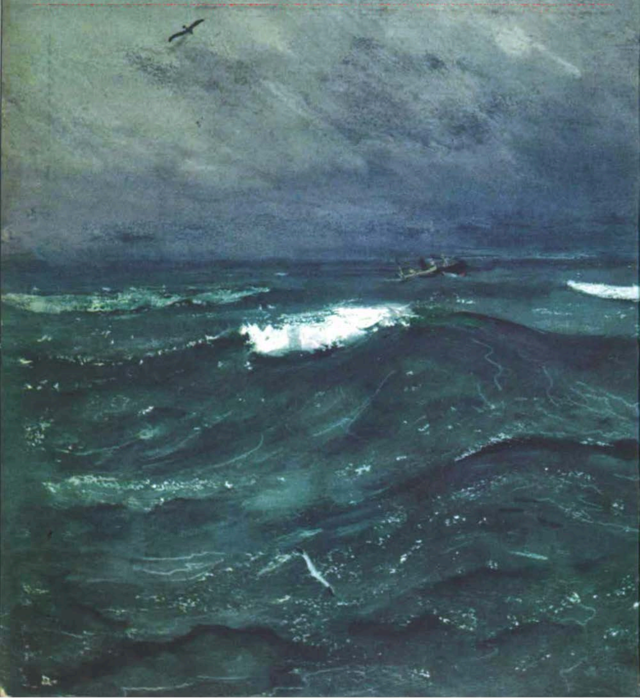
আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে আমরা বেশ ঘুরলাম, তাই না? মজাদার বাঁদরগুলোর লম্ফঝম্ফ দেখা হলো, শিঙার আওয়াজের মতো হাতির ডাক আর কুমিরের গর্জনও শুনেছি, সুস্বাদু কলাও বেশ খেয়েছি। এমনকি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের অশ্রান্ত বাদলধারায়ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছি... তারপর এক সময় কখন যে নিরক্ষরেখা পার হয়ে চলে এসেছি,. লক্ষ্যই করি নি। যাক গে, এখন তাহলে আমরা দক্ষিণ গোলার্ধে। ফের ওঠা যাক উড়োজাহাজে, আরো দক্ষিণে যাই চলো।

দক্ষিণে। মানে, সেখানে কি আরো গরম হবে? না, নিরক্ষরেখা থেকে আমরা যতোই দূরে যেতে থাকবো ততই গরম কমে গিয়ে শীতলতা আসবে। উত্তর গোলার্ধেও ঠিক এমনটাই ঘটে: নিরক্ষরেখার যত কাছে আসবে তুমি, ততই গরম হতে থাকবে জলবায়ু, আর দূরে চলে যাও, অমনি ঠাণ্ডা জলবায়ুর দেখা পাবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের দক্ষিণে, ঠিক উত্তরে যেমনটি ছিল সেরকমই, পড়ে আছে স্তেপ ভূমি — সাভান্না। তবে দক্ষিণ গোলার্ধে কি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য, কি সাভান্না উভয়ই পরিমাণের দিক থেকে উত্তর গোলার্ধের চেয়ে কম। দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে মহাসাগর। এবার তাহলে সাগরের বুকে ভেসে যাওয়া যাক, কি বলো!

কিন্তু সমুদ্র যে বড়ো অমিত্রসুলভ ব্যবহার শুরু করলো — সামুদ্রিক ঝড় এসে গেল যে··· বিশাল বিশাল ঢেউ আমাদের জাহাজটাকে যেন তাড়া করে ফিরছে, আছড়ে পড়ছে খাড়া উঁচু জাহাজের গায়।







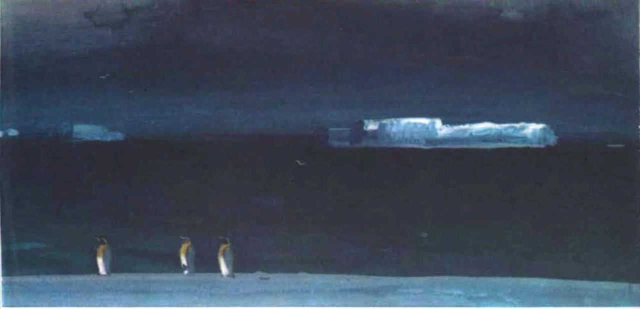


জাহাজটা কেঁপে কেঁপে উঠছে আর টাল সামলাচ্ছে মহাকষ্টে, একবার ঝুঁকে পড়ছে নাক নিচু করে সামনের দিকে, তো ফের তার পশ্চাদ্ভাগ দেবে যাচ্ছে অনেকখানি... গর্জে উঠছে মহাসাগর, হুঙ্কার দিচ্ছে ঝড়, সাঁ-সাঁ শব্দে শিস্ দিচ্ছে বাতাস। ঢেউগুলো যেন লোফালুফি করছে জাহাজটাকে। দক্ষিণে, আরো দক্ষিণে যাচ্ছি আমরা। যত দিন যাচ্ছে প্রতিদিনই বেশি ঠাণ্ডা পড়ছে — কারণ আমরা তো ক্রমেই কুমেরুর দিকে, অর্থাৎ তুষারাবৃত অ্যান্টার্কটিকা অভিমুখে যাচ্ছি।

যাক্, শেষ পর্যন্ত তাহলে বাতাস পড়ে এলো, শান্ত হয়ে এলো সমুদ্র। কিন্তু আমাদের সামনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে? সমুদ্রের উপরে উঁচু হয়ে উঠেছে জলরাশি, যেন ফোয়ারার জল উপরে উঠছে পিচকারি দিয়ে! ফোয়ারা, ঐ তো আবার একটা ফোয়ারা... ওহ্, বোঝা গেল, আমরা তাহলে তিমি মাছের ঝাঁকের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। মহাবিশাল এই প্রাণীটি কিন্তু বড়ো শান্ত প্রকৃতির। ওরা জানে, জাহাজ ওদের কোনো ক্ষতি করবে না।

দূরে চোখে পড়ছে সাদা উঁচু একটা পাহাড়। সে কী, সমুদ্রের ভিতরে পাহাড়? ওটা হলো আসলে ভাসমান হিমশৈল — ঐ পাহাড়টা সমস্তই বরফের। ওর কাছ থেকে আমাদের দূরে থাকা দরকার। হিমশৈলের সঙ্গে একবার ধাক্কা লাগলে জাহাজ ডুবে যেতেও পারে।

এই হিমশৈল ভেসে আসছে দক্ষিণ থেকে, তুষারাবৃত অ্যান্টার্কটিকা থেকে। কী বিশাল উঁচু — জলের উপরিভাগে অন্তত শ'খানেক মিটার তো হবেই, আর জলের তলায় হিমশৈলের যতখানি রয়ে গেছে তা হবে আরো কয়েকগুণ বেশি।



আমাদের পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত এই অ্যান্টার্কটিকা। সারা বৎসর তা ঢাকা থাকে বরফে। সেখানে কোনো কোনো জায়গায় বরফ চার কিলোমিটার অবধি পুরু। অ্যান্টার্কটিকায় কেবল যে পৃথিবীর কুমেরু অবস্থিত তাই নয়, এ জায়গাটি শীতের কেন্দ্রভূমিও বটে। শীতকালে কুমেরুর কাছে ঠান্ডার পরিমাণ মাইনাস ৮০ সেন্টিগ্রেডেরও বেশি। আর গ্রীষ্মকালে সেখানে আমাদের রুশী শীতের চেয়েও বেশি ঠান্ডা থাকে! কেবল সমুদ্রতীরের তুষারস্থল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে, ফলে তুষার-প্রান্তরের উপরেই জল জমে ওঠে।

অ্যান্টার্কটিকায় না আছে কোনো শহর, না আছে কোনো জনবসতি। কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরাই এখানে আসেন বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানোর জন্যে।

আমাদের সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও অ্যান্টার্কটিকায় অভিযান চালনা করেন। তাঁরা থাকেন বিশেষভাবে নির্মিত ঘরবাড়িতে।

তবে হ্যাঁ, তুষারাবৃত অ্যান্টার্কটিকায় স্থায়ী বাসিন্দাও কিছু আছে বৈকি। তারা হচ্ছে — পেঙ্গুইন পাখি। পেঙ্গুইনের ডানা খুব ছোটো হওয়ায় ওরা উড়তে পারে না, কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে অত্যন্ত দ্রুত, চমৎকার ডুব দিতে পারে। ওদের খাদ্য হলো মাছ।

মাদী পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়ে মাত্র একটা, তাও বাসায় নয়, কেননা বাসাই যে নেই ওদের। পায়ের চওড়া পাতার উপরে ওরা ডিম পাড়ে। পায়ের পাতাতে ডিম রেখে পেঙ্গুইন পাখি ধীরে ধীরে চলাফেরাও করতে পারে। খুব কৌতুহলী হয় ওরা, লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করে, ভালবাসে গান শুনতে। পেঙ্গুইনরা যখন সমুদ্রতীরে হেলেদুলে চলাফেরা করে, তখন মনে হয় যেন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে।





এর পরে কী?

পৃথিবীর উপরে ঘুরতে ঘুরতে তাহলে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত আসা গেল। দেখলে তো এ পৃথিবীতে প্রকৃতি কতো বিচিত্র, কতো বিভিন্ন গাছপালা, জীবজন্তু ও পশুপাখিতেই না সমৃদ্ধ। আমরা এতদিনে ভূ-পর্যটক হয়ে গেছি। কিন্তু এবারে বলো দেখি: দক্ষিণ মেরু থেকে আমরা পিছন পানে ফিরে না গিয়ে যদি আরো সামনে চলি তাহলে কী দেখবে?

তাহলে এবার কোন দিকে যাওয়া যায়? আরো দক্ষিণে?

ভালো করে ভাবো তো দেখি।



যারা ধাঁধায় পড়েছে...

ঠিক আছে, যারা কিছু আন্দাজ করতে পারছো না, তাদের চুপিচুপি বলি: দক্ষিণ মেরু থেকে এক কেবল উত্তর দিকেই যাওয়া সম্ভব। কেননা দক্ষিণ মেরু — সে যে পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্তবিন্দু।

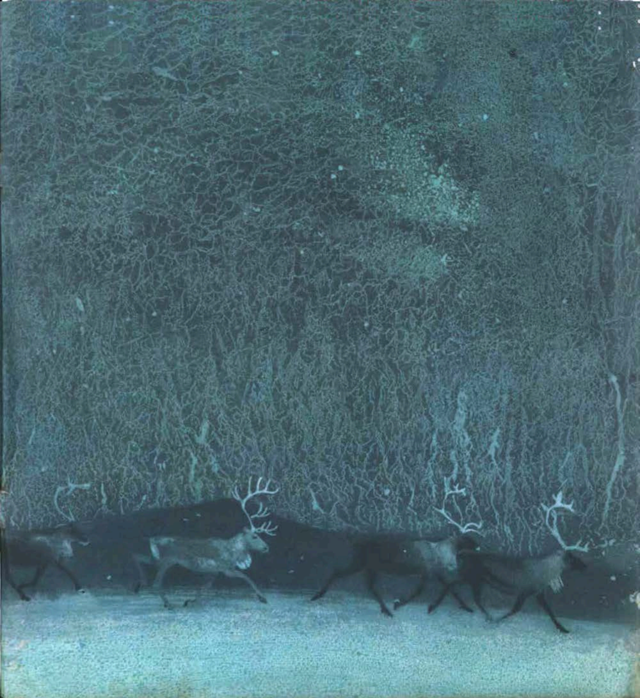
দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে কাছে হলো আমেরিকা। চলো, আমরা তাহলে এবার আমেরিকা হয়ে যাই।

উত্তর মুখে যাচ্ছি এখন। এত উঁচু থেকেও কিন্তু চোখে পড়ছে — অরণ্য, মরু, স্তেপ কীভাবে একটার পর একটা যাচ্ছে আসছে। এখানকার স্তেপে দেখতে পাচ্ছি বাইসনের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা পুনর্বার নিরক্ষরেখা অতিক্রম করতে যাচ্ছি, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে গিয়ে পড়বো উত্তর গোলার্ধে। উড়োজাহাজের ডানার নিচে ফের ভেসে উঠছে উত্তর মেরুসাগর আর উত্তর মেরু...

ব্যস, এখন তাহলে স্বচক্ষেই আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের পৃথিবী — গোলাকার; জানতে পারলাম, উত্তরের চেয়ে দক্ষিণ যে সবসময়েই অপেক্ষাকৃত গরম হবে এমন নয়; বুঝতে পারলাম, অরণ্য, মরু ও স্তেপ পৃথিবীর বুকে মোটেই যেন-তেন প্রকারে হেথাহোথা ছড়িয়ে নেই, আসলে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মেই ওরা একটার পর আরেকটা অবস্থিত।







সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г. Ганейзер

ГЕОГРАФИЯ В КАРТИНКАХ

На языке бенгали

Перевод сделан по книге: Г. Ганейзер «География в картинках»
М. «Дет. лит.», 1971 г.

Г $\frac{70802-139}{014(01)-79}$ 653–78